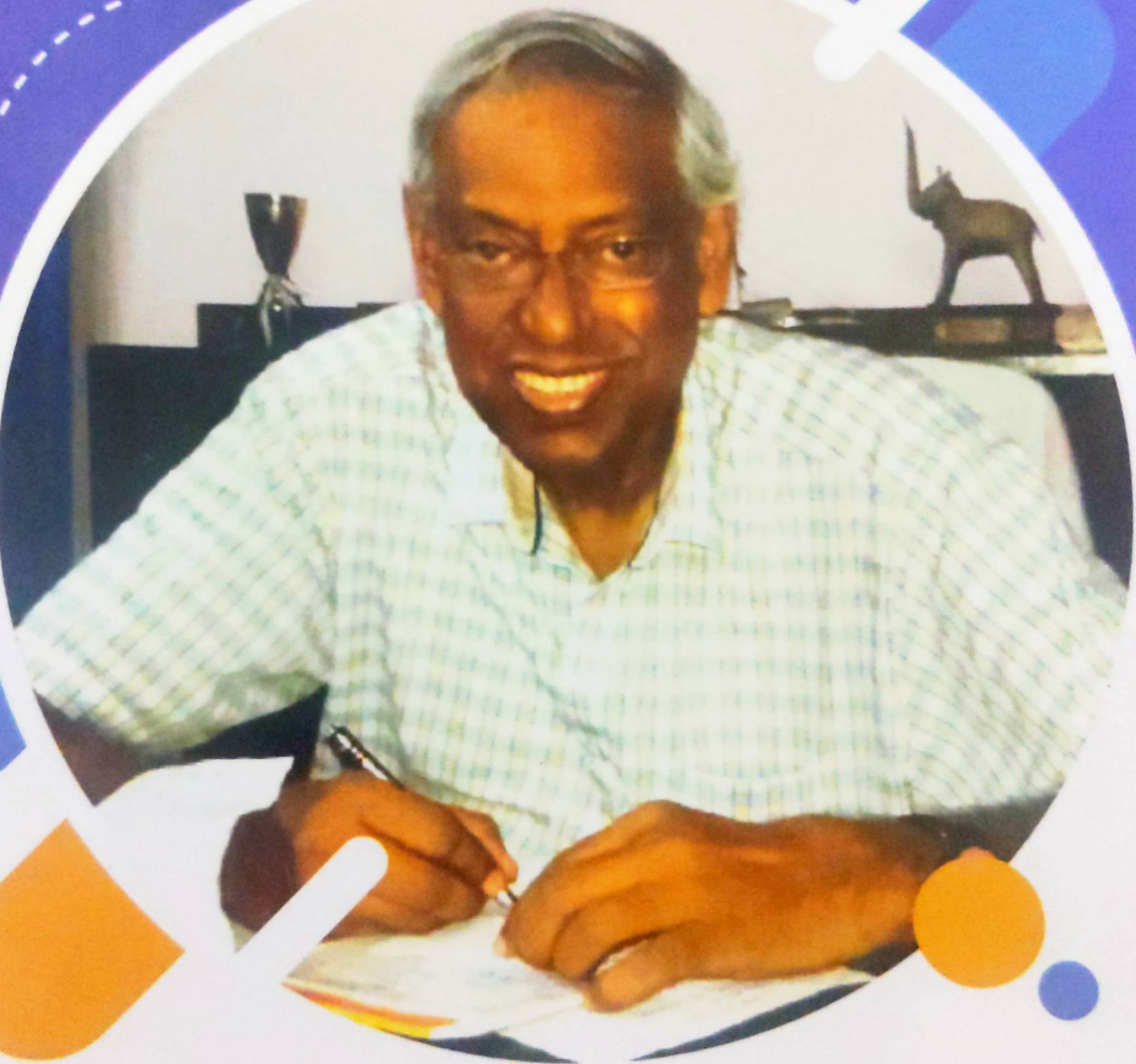


মানবাবিকার সংগ্রামী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী

বিপ্লব হালিম-এর

৭৮তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন



বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা এবং সম্মান প্রদান
(৮ম বর্ষ)



বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা এবার অষ্টম বছরে পা দিল। এই উপলক্ষে বিগত বছরের মতন এবছরেও আমরা আয়োজন করেছি এক স্মারক বক্তৃতা, বিষয় ‘স্বাধীনতার অমৃতকাল: ফিরে দেখা’। এ বছরের স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন প্রখ্যাত অধ্যাপক রতন খাসনবিশ মহাশয়।

১৯৪৭ সালে, স্বাধীনতার সোনালি বছরেই বিপ্লব হালিমের জন্ম এই কলকাতা শহরে, বেড়ে ওঠা এমন এক রাজনৈতিক পরিবারে ও পরিমণ্ডলে যেখানে সাম্য ও মানবাধিকারের লড়াই ছিল জীবনের মূল মন্ত্র। ছাত্র বয়েস থেকেই মূলধারার রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে, সে যুগে সাম্যবাদী আন্দোলনের যুব নেতা হিসেবে বিপ্লব হালিম হন সুপরিচিত। জীবনের পরের অধ্যায়ে বিপ্লব হালিম সেই সাম্যবাদী রূপকল্প নিয়েই কাজ করে গেছেন সমাজসেবী হিসেবে; সাধারণ মানুষের মাঝে থেকে সামিল হয়েছেন তাদের অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। একজন মানবাধিকার কর্মী ও সমাজসেবী হিসেবে তিনি সাধারণ মানুষকেই দেখতে চেয়েছেন উন্নয়নের কাণ্ডারী হিসেবে, রূপকার হিসেবে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা, যুব সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা, প্রান্তিক কৃষক, কৃষক রমণী, মৎসজীবী, বনসম্পদের উপর নির্ভরশীল আদিবাসী গোষ্ঠী প্রভৃতিদের সম্পদের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা, সম মজুরি ও সকল ক্ষেত্রেই তাদের সমান অধিকার লাভের জন্য বিবিধ আন্দোলনই ছিল তার সমাজসেবা।

আজ দেশে বহু সমাজসেবী সংগঠন ও অনেক সমাজসেবী মানুষ যখন বর্তমানের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশের সঙ্কটকালে সমাজসেবার নতুন অর্থ অন্বেষণ করছেন, তখন বিপ্লব হালিমের বহুমুখী কর্মকাণ্ড তাদের নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

এবারের বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা বিষয়টিও ‘স্বাধীনতার অমৃতকাল: ফিরে দেখা’; স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের আর্থ-সামাজিক নীতি ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল আমাদের আজ উন্নয়নের কোন সোপানে এনে দাঁড় করিয়েছে? স্বাধীনতার রূপকারদের স্বপ্নের ভারত, যা সাম্য ও সম্প্রীতির নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, বর্তমানে তার স্বরূপটি কী? ভবিষ্যতের চলার পথনির্দেশই বা আমরা খুঁজব কোন নীতি, আদর্শের মধ্যে? এই নিয়েই এবারের স্মারক বক্তৃতা। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক রতন খাসনবিশ মহাশয়কে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, এবারের স্মারক বক্তৃতা দিতে সম্মত হওয়ার জন্য।

অন্যবারের মতো, এবছরেও আমরা বিপ্লব হালিম সমাজসেবা সম্মান তুলে দেব চারজন বিশিষ্ট সামাজিক কর্মী/ব্যক্তিত্বের হাতে, যারা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে নিরলস ভাবে মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছেন, প্রচারের আলোর পরোয়া না করে। এই চারজন হলেন অধ্যাপক দেবাশীষ সরকার, শ্রী সুবীর দাশগুপ্ত, শ্রীমতী সান্তনা দাস ভোল্লা ও শ্রীমতী তাপসী বিশ্বাস। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমি এঁদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

ইমসে ও বিপ্লব হালিম মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্কের সম্মানিত সেক্রেটারি, শ্রদ্ধেয় স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজকে; তাঁর আশীর্বাদ আমাদের এই শুভ উদ্যোগকে প্রতিবারের মতো এবারেও সিদ্ধি করেছেন।

ইমসে ও বিপ্লব হালিম মেমোরিয়াল কমিটির সাথে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাই, যাদের নিরলস প্রচেষ্টায়, শত সীমাবদ্ধতা থাকলেও এবছরেও আমরা অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতে পেরেছি।

আর পরিশেষে স্বাগত জানাই সকল অংশগ্রহণকারীদের, যারা এই স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে শহর কলকাতা ও এ রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে এসেছেন। ২০২৫-এর বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা ও সমাজসেবা সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

উজ্জয়িনী-হালিম
(উজ্জয়িনী হালিম)

অধ্যাপক (ড.) দেবাশীষ সরকার



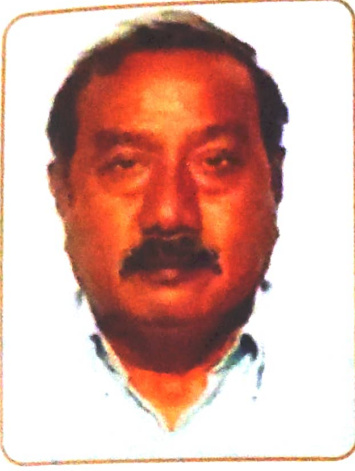
অধ্যাপক (ড.) দেবাশীষ সরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক ছিলেন এবং সম্প্রতি ২০২৫ সালে অবসর গ্রহণ করেছেন। এর আগে ২০১১-২০১৩ সালে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার দ্বারা ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত কৃষি-অর্থনৈতিক গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তার দায়িত্বও পালন করেছেন।

অধ্যাপক সরকার বীরভূম জেলার একটি অত্যন্ত পুরাতন ও পূর্বতন জমিদার শ্রমিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছোটবেলা কেটেছে শান্তিনিকেতন এবং শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় পরিমণ্ডলে। পরবর্তীকালে এর প্রভাব পড়েছে তাঁর কর্মধারায় এবং কাজের শৈলীতে। কয়েক দশক ধরে কৃষি অর্থনীতির একজন সচেতন গবেষক হিসেবে তিনি গ্রাম বাংলার সীমাহীন শক্তিমত্তার ওঠানামা খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করেছেন। এর ফলস্বরূপ প্রায় ৭৫টি গবেষণা পত্র এবং ১৬টি পুস্তক বিভিন্ন দেশ এবং বিদেশের বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকায় এবং প্রকাশক দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এইসব গবেষণা লব্ধ ফল কৃষি অর্থনীতি এবং সামগ্রিকভাবে কৃষিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। গত প্রায় চার দশক অধ্যাপনায় যুক্ত থেকে তিনি অসংখ্য ছাত্রছাত্রী নিজের হাতে তৈরি করেছেন এবং তারা আজ দেশে বিদেশে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। অধ্যাপক সরকারের অধীনে নানা প্রদেশের ১১ জন ছাত্রছাত্রী গবেষণা করেছেন এবং পিএইচ.ডি. উপাধি পেয়েছেন। বরিষ্ঠ অধ্যাপক এবং কৃষি অর্থনীতিতে বিশেষ অবদানের জন্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স, মুম্বাই ২০২৪ সালে অধ্যাপক সরকারকে অত্যন্ত সম্মানীয় এন. এ. মজুমদার পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করেছে। অধ্যাপক সরকার অধ্যাপনা এবং গবেষণার বাইরে সামাজিক অসাম্যের ক্ষেত্রে এবং মানুষের সেবায়ও তার অবদান রেখেছেন। বোলপুর-শান্তিনিকেতনের

গ্রামের মানুষদের সঙ্গে নিয়ে জমি মাফিয়াদের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে একটি অতি সক্রিয় সংগঠন 'ভূমি সুরক্ষা কল্যাণ সমিতি' গড়ে তুলেছেন, যা আজ অনেক গরীব এবং প্রান্তিক চাষিদের ভরসার স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ভূমি সুরক্ষা কল্যাণ সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে অধ্যাপক সরকার এক বিশেষ জন চেতনার সাক্ষী। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কৃষি অর্থনীতির গবেষণা এবং বিস্তারের জন্য 'কৃষি অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা সমিতি' গঠন করেছেন যা আজ ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

অধ্যাপক সরকার ভারতীয় কৃষি এবং কৃষি অর্থনীতির শিক্ষক এবং গবেষক হিসাবে নিরলস ভাবে মানুষের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন যা সামগ্রিক ভাবে চাষ এবং চাষিদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

শ্রী সুবীর দাশগুপ্ত



শ্রী সুবীর দাশগুপ্ত ১৯৫৯ সালে ২৫শে জানুয়ারী তারিখে ধানবাদে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বাবার বদলির সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ায় চলে আসেন। এখানেই তিনি তাঁর উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি তাঁর অদম্য উৎসাহ ছিল। পাশাপাশি মায়ের আদর্শে আদর্শায়িত হয়ে সবসময় অন্যায়ের প্রতিবাদে সচেষ্ট থেকেছেন। কলেজে

পড়াকালীন তাঁর তত্ত্বাবধানে সাতটি নাইটস্কুল চালানো হয়, যা মূলত স্থানীয় গরীব ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করতেই শুরু হয়েছিল। এর পরে পেশার তাগিদে তিনি চলে আসেন কলকাতা। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও মানবাধিকার কর্মী বিপ্লব হালিমের সান্নিধ্যে এসে তিনি ইমসেতে যুক্ত হন ১৯৮৬ সালে। এর পরেই তিনি সমাজ সেবার আদর্শকে উপলব্ধি করেন মনে প্রাণে। বিপ্লব হালিমের আদর্শে আদর্শায়িত হয়ে তিনি স্বেচ্ছাসেবীতার গুরুত্ব অনুধাবন করেন। প্রায় চল্লিশ বছরের কর্মজীবনে তিনি অক্লান্ত ভাবে কাজ করে গেছেন মানুষের স্বার্থে। বীরভূম, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা সহ বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে গেছেন অনায়াসে। দিনের পর দিন অতিবাহিত করেছেন তাদের সাথে।

তাঁর এই স্বেচ্ছাশ্রম, আপোষহীন মনোভাব এবং অনবদ্য সাংগঠনিক ক্ষমতা আজও বিদ্যমান। শ্রী সুবীর দাশগুপ্তের হাতে সম্মান তুলে দিতে পেরে ইমসে পরিবার আনন্দিত।

২০২৫-এর সম্মানিত সমাজসেবিকা

শ্রীমতী সান্তনা দাস ভোল্লা



শ্রীমতী সান্তনা দাস ভোল্লা, দুবারি মহিলা সমন্বয় কমিটির একজন সক্রিয় সদস্যা। ২০০০ সাল থেকে তিনি যৌনকর্মী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সাথে যুক্ত, পাশাপাশি সাংগঠনিকভাবে ২০০৩ সাল থেকে যৌন রোগ এবং এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ প্রতিরোধ করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

বিশেষ করে যৌনকর্মী জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা, জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক আত্মমর্যাদাকে কেন্দ্র করে সঙ্গবদ্ধ ভাবে বিভিন্ন অসংগঠিত পেশাজীবী মানুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

যৌনকর্মী সহ সমাজের বিভিন্ন মানুষকে যৌনরোগ প্রতিরোধ করার কাজকে নেতৃত্ব দিয়ে বিভিন্ন পন্থায় যৌনরোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করার কাজে বিরল সফলতা অর্জন করেছেন।

সর্বোপরি তিনি পেশাগতভাবে দুবারি অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে সরকার এবং সমাজের থেকে যৌনকর্মী জনগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনের একজন লড়াকু সৈনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

শ্রীমতী তাপসী বিশ্বাস



শ্রীমতী তাপসী বিশ্বাস নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ১৯৫৬ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তিনি কৃষ্ণনগরে স্কুল এবং কলেজ পর্ব পার করে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ, বি.এড করার পর শিক্ষকতার জগতে প্রবেশ করেন। ধুবুলিয়া দেশবন্ধু হাইস্কুলে ইংরেজি ভাষার শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন ১৯৮০ সালে।

এই স্কুলে থাকাকালীন তিনি বাংলায় এম.এ এবং ইংরেজি ভাষার ডি.ই.এল.টি ক্লাসটি করেন। ধুবুলিয়া স্কুলের অনন্য অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। পরে ১৯৮৭ সালে দক্ষিণ কলকাতার ১৯৩ বছরের পুরানো ঐতিহ্যমণ্ডিত “ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস হাই স্কুলে” তিনি যোগ দেন এবং দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করার পর ২০১৬ সালে অবসর নেন। এই স্কুলের কাছে তাঁর ঋণের শেষ নেই। এই স্কুলে চাকরি করা কালীন তাঁর জীবনে আসে এক অনন্য সম্মান। “টেলিগ্রাফ স্কুল এ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স ২০১৬” তাঁকে দেওয়া হয়।

জীবনের পথে এগোতে এগোতে তাঁর মনে হয়েছে মেয়েদের মধ্যে রয়েছে অমিত শক্তি। মেয়েদের আর্থিক স্বয়ম্ভরতারও খুব প্রয়োজন। এই ভাবনা থেকেই পাড়ার মহিলাদের নিয়ে ২০১৬ সালের মে মাসে গড়ে ওঠে “আনন্দধারা” নামে একটি সংস্থা। এই নামে যেহেতু একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে তাই রেজিস্ট্রেশনের সময় “আনন্দধারার” নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় ‘আমরা আনন্দিনী’।

“আমরা আনন্দিনী” দুটি বিশেষ ভাবে সক্ষম বাচ্চার পথ্যের জন্য প্রতি মাসে আর্থিক সাহায্য করে। একটি দুঃস্থ পরিবারকে ওষুধের জন্য নিয়মিত সাহায্য করে থাকে। বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের “মা সারদা বিদ্যামন্দির” স্কুলের বাচ্চাদের টিফিনের জন্য নিয়মিত আর্থিক সহায়তা করে।

পুজোর সময় রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামের বাচ্চাদের পোশাকের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ প্রদান করে ধন্য হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে, বৃদ্ধাবাসে, অসুস্থ মানুষের চিকিৎসায় “আমরা আনন্দিনী” সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, যদিও সামর্থ্য খুবই সীমিত।

মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারলে যে নির্মল আনন্দ পাওয়া যায় তা অতুলনীয়। “আমরা আনন্দিনী”র সদস্যরা এই সুযোগ পেয়ে ধন্য।
